এলাটিং বেলাটিং

শামসুর রাহমান

এলাটিং বেলাটিং

শামসুর রাহমান

অন্যরকম লোক

ইস্টিশানে নামল দেখি
একজন লোক তাগড়া।
কেউ বলে তার তুরান বাড়ি,
কেউ বলে, না, আগ্রা।
দেখছি না তো পাজামা তার,
দোল খেয়ে যায় ঘাগড়া।
পাগড়ি সে তো পায়ে বাঁধে,
মাথায় পরে নাগরা।
তাই-না দেখে বাজপাখিটা
দিল ভীষণ বাগড়া।

আঁকিয়ে

এই শহরে এক যে ছিল আঁকিয়ে,
আঁকত ছবি ঘাড়টা কিছু বাঁকিয়ে।
মাঝে-মাঝে গোঁফটা শুধু পাকিয়ে
বৈঠকে সব বসত বটে জাঁকিয়ে।
ছবি দেখে বলত সবাই, 'ফাঁকি এ' ।
বুক ফুলিয়ে চুলের ঝুঁটি ঝাঁকিয়ে
নিজের ছবি দেখত নিজেই তাকিয়ে।

আঁটুল বাঁটুল ছড়া

আঁটুল বাঁটুল শামলা সাঁটুল, শামলা গেছে হাটে।
কুঁচবরন কন্যা যিনি, তিনি ঘুমান খাটে।
খাট নিয়েছে বোয়াল মাছে, কন্যে বে কাঁদে,
ঘটি বাটি সব নিয়েছে, কিসে তবে রাঁধে?
আর কেঁদো না, আর কেঁদো না, ছোলা ভাজা খেয়ো,
মাটির ওপর মাদুর পেতে ঘুমের বাড়ি যেয়ো।

আজব গান

আজব কথার আজব সুরের গান চলেছে বেতারে।

তফাত বোঝা দায় হ’ ল রে তবলা এবং সেতারে।

গানের খোঁচায় প্রাণ গেলবে, কোন দেশী এই কেতারে?

বলল হেঁকে ধোপার গাধা গান গাবে সে-ও বেতারে।

আমায় নিয়ে যা

নীলে ঘোড়া নীলে ঘোড়া পক্ষিরাজের ছা,
মেঘডুমাডুম আকাশপারে তা থৈ তা থৈ তা।
মেঘের দোলায় চললি কোথায়, কোন সে অচিন গাঁ?
আয়-না নেমে গলির মোড়ে করবে না কেউ রা’ ।
খিড়কি-দুয়োর কেটে দেব আস্তে ফেলিস পা,
সাগরপারের চাল দেব পেটটি ভরে খা।
মাছের কাঁটা ফুটল পায়ে, হাঁটতে পারি না-
চিকচিকে তোর ডানায় করে আমায় নিয়ে যা।

কাকের ছায়া

কাঠফাটা সেই দুপুরে
কাকটা গেল পুকুরে।
পানি খাওয়ার আমেজে
পুকুরপাড়ে নামে যে।
সরিয়ে ঝরা পাতাটা,
দেখে কাকের মাথাটা।

কে এল ফের দুপুরে
ভাগ বসাতে পুকুরে?
ঠুকরে মজা পানিকে
নিজের ছায়া খানিকে
তাড়িয়ে দিয়ে ঘুসিতে
নেচে ওঠে খুশিতে!

খুকুমণির বিয়ে

আয়রে আয় টিয়ে,
খুকুমণির বিয়ে।
সোনার মাদুর পেতে
লংকা দেব খেতে।
আয়রে টিয়ে ছুটে,
ছোলা খাবি খুঁটে
টুকটুকে ঠোঁট দিয়ে।
লাল জুতুয়া প’ রে
বর আসবে ঘরে।
হেই টিয়ে তুই দাঁড়া,
লেজের ডগা নাড়া
বরের কাছে গিয়ে।
বরের মাথা খালি,
বাজা সবাই তালি।
কানতো বরের কুলো,
টোপর নিল হুলো-
কী ক’ রে হয় বিয়ে?

খোকন গেছে ক্ষীরসাগরে

আলুর পাতা আলুথালু বেগুন পাতায় দই,
সাতটা কাকে খেয়ে গেল, খোকন গেল কই?
খোকন গেছে পাঠশালাতে লাল গামছা গায়,
বইগুলো সব রইল পড়ে বুড়ো বটের ছায়,
খোকন গেছে ক্ষীরসাগরে ময়ূরপঙ্খি নায়।

খোকন সোনা দোলে

চাঁদ দোলে সুয্যি দোলে,
দোরে নদীর জল।
দোলে আমার খোকন সোনা,
দোলে হীরের ফল।

সোনার গাছে ডাকছে ব’ সে
কোন সে পাখি বল?
হীরামনের মিতা বুঝি
নামায় সুরের ঢল।

চাঁদ দোলে সুয্যি দোলে
দোলে ফুলের দল।
জোছনা-দড়ির দোলনা দোলে,
দেখবি সবাই চল।

খোকা নাচে

বাগদি পাড়ার বাগদি, তকেই আমি ডাক দি।

ডাক শুনে ভাই জলদি বাগদি আনে হলদি।

হলদি দিয়ে করব কী? নাকে তোমার ভরব কী?

বাগদি ভাবে জিরিয়ে, হলদি নেবে ফিরিয়ে।

একটা দুটো রেখে যা, খোকার নাচন দেখে যা।

নাচবে খোকা এখনি, এমন নাচন দেখনি।

খোকা নাচে জলদি, গায়ের বরন হলদি।

চরকাবুড়িমার্চ

চরকাবুড়ি চরকাবুড়ি চাঁদের ঘরে ব’ সে
মেঘের পেঁজা তুলো নিয়ে চরকা ঘোরাও কষে।
নেই পাজামা, নেইকো জামা গোটা শহরটায়,
চাঁদের ঘরে কী করে যাই আজকে আদুল গায়?
চরকাবুড়ি টুকটুকে লাল একটা জামা দিয়ো,
তার বদলে শুকনো গালে হাজার চুমো নিয়ো।

ছড়ার এ-বই

আমার ছড়ার এ-বই পড়তে দেব কাদের?
এ-বই পড়ার মতো সময় আছে যাদের,
তাদের, তাদের, তাদের।

যারা জোছনা-রাতে দেখে পরীর নাচ,
যারা জানলা দিয়ে দেখে সোনার গাছে,
যারা হয়রে মাঝি নায়েব মতো চাঁদের,
চাঁদের, চাঁদের, চাঁদের।
আমার ছড়ার এ-বই হাতে দেব তাদের,
তাদের, তাদের, তাদের।

আমার ছড়ার এ-বই পড়তে দেব কাদের?
মিঠে দুষ্টুমিতে চক্ষু ভরা যাদের,
তাদের, তাদের, তাদের।

যারা বেড়ায় উড়ে পক্ষিরাজের পিঠে,
যারা জিরোয় বঁ’ সে স্বপ্নবাড়ির ভিটে,

যারা ভেলকি বোঝে হঠাৎ মিলের ফাঁদের,

ফাঁদের, ফাঁদের, ফাঁদের।

আমার ছড়ার এ-বই পড়তে দেব তাঁদের,

তাঁদের, তাঁদের, তাঁদের।

জটিবুড়ির ছড়া

থেনা থেনা থেনা ওমা বট পাকুড়ের থেনা,
আদ্যিকালের বটের ঝুড়ি জটিবুড়ির চেনা।
জটিবুড়ি জটিবুড়ি দোহাই ফিরে চাও,
ভরদুপুরে তোমার জটের ছায়া দিয়ে যাও।
জটের ছায়া হোক পুরানো, হোক-না কিছু ফিকে,
ভয় পেয়ো না, দামটি পাবে পুরো আড়াই সিকে।

জল-টুপটুপ

জল-টুপটুপ দিঘির পাড়ে ডালিম গাছের ডাল,
ডালিম গাছে জল ঢেলেছে খুকুমণি কাল।
তোতাপাখি লেজ নাচাল, ডালিম গাছে মৌ,
হঠাৎ দেখি ডুব দিয়েছে লাল শালুকের বৌ।
লাল শালুকের বৌ-এর মাথায় মুক্তো জমে ঐ,
মুক্তো নিল হাওয়ার রাজা, আমরা চেয়ে রই।

জুতোর বাহার

একটা লোকের উঠোন-জোড়া
জুতোর বহর মস্ত।
জুতোর ভেতর লোকটা জানি
উঠত এবং বসত।
ঘরহারা কেউ ঝড়ের পরে
ধরলে ঘরের বায়না,
লোকটা তখন বলত ডেকে,-
"জুতোর ভেতর আয়-না?"

ফতুরমার্চ

ও-পাড়ার ঐ লতু বেজায় চতুর,
হাজার কয়েক কড়ি ছিল লতুর।
অষ্টপ্রহর লেগেই আছে ভোজ যে,
গপ্ গপা গপ্ গিলত গজা রোজ সে,
গজা খেয়েই লতু হ’ ল ফতুর।

যখন-তখন

ভাইয়া বড় দুষ্টু ওরে, ভাইয়া ভারি বিশ্রী।
কথায় যেন উচ্ছে মাখা, একটুও নেই মিছরি।
যখন-তখন প্রশ্ন করে, জিগেস করে নামতা,
ভড়কে গিয়ে সব ভুলে যাই, নামতা যে হয় আমতা।
"টরটইজের বাংলা কী রে?"-ব' লেই ধরে কানটা,
বলার আগেই হ্যাঁচকা টানে বেরিয়ে আসে জানটা।

লম্বা গলা

সিরাপ খেয়ে জিরাফ পেল
গলা ইয়া লম্বা।
লম্বা গলায় কী এসে যায়,
কার চেয়ে সে কম বা?
জেনে রাখো লাভ আছে ঢের
গলা হলে লম্বা।
মই লাগে না পাতা খেতে,
খেতে পাকা রম্ভা।

লোকটা

লোকটা লিখে মজার ছড়া
মাথায় গুঁজে রাখত।
চাইলে পরে ছড়াগুলোর
নাম ধ’ রে সে ডাকত
পাখির মতো নানান ছড়া
বাবরি ছেড়ে আসত।
লোকটা গোঁফে মোচড় দিয়ে
একটু কেশে হাসত।
বলত শুধু “আমার ছড়া
সত্যি নিতে চাস তো?
আমার ছড়া টিয়ের মতো
ঠোকর মারে জোরসে;
দোষ দিবিনে দুই চোখে তুই
দেখিস যদি সর্ষে” ।

শীতের ছড়া

শীতসকালে লোকটা কাঁপে,
কাঁদে সবার পা ধ’ রে।
একটা শুধু ছিল জামা,
তা-ও ছিঁড়েছে ভাদরে।
হি-হি শীতে থাকে প’ ড়ে,
ডাকে না কেউ আদরে।

বলল তাকে খোকন সোনা,
মিছে কেন কাঁদরে?
একটু তুমি ধৈর্য ধরো,
সাহসে বুক বাঁধোরে।
শহরটাকেই দিচ্ছি ঢেকে
পশমি বড় চাদরে।

সুয্যিমামা

আজকে হঠাৎ সুয্যিমামার
মেজাজ হল গুম,
কালো চাদর মুড়ি দিয়ে
খুব দিয়েছে ঘুম।
তাইতো দেখি দিনের বেলা
অন্ধকারের ধুম।

নোলক নেড়ে শোলক ব’লে
পলাশতলির গাঁয়
কাজলা দিনে কন্যা নাচুক
লাল খাড়ুয়া পায়।
ঘাটের আড়ে, মাঠের ধারে
ডাকুক পাড়ার লোক,
সুয্যিমামা পণ করেছে
খুলবে না সে চোখ।